দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ . 23 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ......

নায়েমে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি

অভিযুক্ত সাবেক মহাপরিচালক ও বর্তমান এক উপ-পরিচালক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীর (নায়েম) সম্প্রতি চুক্তি শেষে অবসরে যাওয়া মহাপরিচালক ও বর্তমানে কর্মরত এক উপ-পরিচালকের বিরুদ্ধে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটি এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পায়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পৃথক পৃথক নির্দেশনার ভিত্তিতে এ তদন্ত করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। ড. শামসুর রহমান ২০০৮ সালের ১৮ মে নায়েমের মহাপরিচালক হিসেবে পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

নায়েমে দুর্নীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দু'বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পান। গত ১৯ মে তার চুক্তি শেষ হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি যখন তদন্ত করছিল, তখন শামসুর রহমান মহাপরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে রিপোর্ট জমা দেয়া হয় মন্ত্রণালয়ে। বর্তমানে অন্য এক অধ্যাপককে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

নায়েমের সম্প্রতি অবসরে যাওয়া মহাপরিচালক শামসুর রহমান ও উপ-পরিচালক (প্রশাসন) কে এম কওসার আলীর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের প্রমাণ পায় কমিটি।

নায়েমের বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মহাপরিচালকের চুক্তি শেষ হয়েছে। নতুন মহাপরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু উপ-পরিচালকের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়ার পরও তিনি ওই পদে বহাল রয়েছেন। যা নায়েমের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করবে। তারা আরো বলেন, সাবেক মহাপরিচালকের নানা অনিয়মের সুযোগ করে দিয়েছেন এই উপ-পরিচালক। তাকে এ পদ থেকে সরানো না হলে ভবিষ্যতে অন্য মহাপরিচালকদেরও বিভ্রান্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

যেসব অনিয়ম: মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া ঘন ঘন ভ্রমণ, ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন তৎকালীন এই মহাপরিচালক। এ ধরনের কাজে তাকে সহায়তা করেছেন বর্তমানে কর্মরত উপ-পরিচালক কে এম কওসার আলী। তবে নিজেকে বাঁচানোর জন্য মহাপরিচালক ও উপ-পরিচালক একে অন্যের ওপর দায় চাপিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। মহাপরিচালক নিজেই তদন্ত কমিটিকে বলেছেন, 'তিনি আইন-কানুন ও নিয়মনীতি কম জানেন। উপ-পরিচালক আইন-কানুন ভালো জানেন, তার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন।' আর উপ-পরিচালক বলেছেন, মহাপরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সব কাজ করেছেন।

তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (আইন ও অডিট) মো. রফিকুজ্জামান। কমিটির সদস্যরা হলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হেলাল উদ্দিন ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর তাসলিমা বেগম।

তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ খাতে নায়েমে বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এ সময়ে প্রশিক্ষণ খাতের অব্যয়িত টাকা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। টাকা ফেরত যাবে বলে অব্যয়িত প্রায় ২ কোটি টাকা নায়েমের অন্য খাতে ব্যয় করেছেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিপিডিএম নামক একটি এনজিওকে 'অ্যাডভান্স কোর্স অন রিসার্চ মেথডলজি' প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য নায়েমের প্রশিক্ষণ খাত থেকে টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এ এনজিওর কাজ কী এবং নায়েমে তা কীভাবে কাজে লাগছে তা স্পষ্ট নয়। এমনকি উক্ত এনজিওর নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তদন্ত কমিটি জানায়, অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ খাত পরিবর্তন করে অন্যখাতে ব্যয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি অবহিত না করে মহাপরিচালক এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছেন যা গুরুতর আর্থিক অনিয়মের শামিল। মহাপরিচালক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই গত দুই বছরে সরকারি গাড়ি ও তেল ব্যবহার করে বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করেছেন। মহাপরিচালকের এসব অনিয়মে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন কেএম কওসার আলী। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, নায়েমের অডিটরিয়ামের নামে কেনা দুটি এসি (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র) মহাপরিচালকের বাসায় লাগানো হয়েছে। অডিটরিয়াম ভাড়ায় অনিয়ম করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১১ সালে 'কাজ নাই মজুরি নাই' ভিত্তিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, অফিস সহকারী ৯ জনসহ মোট ৩৭ কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে। যার কোন প্রয়োজন ছিল না। মহাপরিচালক জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য বিভিন্ন জনের সুপারিশে তাদের চাকরি দিয়েছেন। তাকে এ কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন উপ-পরিচালক কওসার আলী।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ফাউন্ডেশন কোর্সের সময় প্রশিক্ষণার্থীরা ২০০ টাকা সম্মানী পান। কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই এ টাকা থেকে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যয়, হোস্টেল ফান্ড এবং সার্ভিস চার্জ হিসাবে ৬৫ টাকা কেটে রাখা হয়।

প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে, মহাপরিচালক হিসেবে প্রফেসর শামসুর রহমান আইন-কানুন, নিয়মনীতি জানেন না বলে তার দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়সহ সব কাজেই 'চেইন অব কমান্ড' মেনে চলা উচিত। শিক্ষা প্রশাসনে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তাদেরই নায়েমে পদায়ন করা উচিত। নচেৎ শিক্ষা বিভাগের জাতীয় পর্যায়ের এ ধরনের একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত হবে।